সাক্ষাৎকার

ড. সাজ্জাদ জহির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যয়ন শেষে কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তিনি দীর্ঘদিন বিআইডিএসে কাজের পর অন্যদের সঙ্গে ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ নামে ভিন্নধর্মী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। অর্থনীতি, উন্নয়ন ও সমাজ গবেষণার বিবিধ অঙ্গনে গবেষণা করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এ অর্থনীতিবিদের অনেক গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ জার্নালে প্রকাশ হয়েছে। দেশের পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্নধর্মী কলাম লেখায় তার সুপরিচিতি আছে। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। বর্তমানে ড. জহির ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক। বাজেট, অর্থ পাচার ও মেগা প্রকল্প নিয়ে *বণিক বার্তার* সঙ্গে সম্প্রতি কথা বলেছেন তিনি।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **এম এম মুসা**

বিদেশে অর্থ প্রেরণ ও স্বদেশে বিনিয়োগকে আইনি কাঠামোয় সংযুক্ত করা প্রয়োজন

নতুন অর্থমন্ত্রীর প্রথম বাজেট হিসেবে এবার কোন বিষয়গুলোয় বেশি নজর দেয়া উচিত বলে মনে করেন?

বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাজেটের আয়ু মাত্র এক বছর। তবে নতুন অর্থমন্ত্রীর এটিই প্রথম বাজেট। ব্যবহারিক ব্যবসার জগৎ থেকে আসার কারণে আশা করা যায়, তিনি ব্যবসার খুঁটিনাটি ভালো-মন্দ অনেক বেশি জানবেন। একই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, তিনি একজন সনদপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট)। স্বাভাবিকভাবে তার চিন্তাভাবনায় নিরীক্ষণ ও অ্যাকাউন্টিংয়ের বিবিধ দিক প্রাধান্য পাবে। আমি সে সম্ভাবনা বেশি দেখতে পাই। এর ভালো দিক যেমন আছে, তেমনি খারাপ দিকও আছে। ভালো দিক হলো, একটি বাজেটের সংগতি ও শৃঙ্খলার প্রতি তিনি যত্নশীল হবেন। ওই বাঁধুনি দিতে গিয়ে তিনি অনেক সম্ভাবনা নষ্টও করে ফেলতে পারেন এবং চাইলে অনেক অনিয়ম ও অনাকাঙ্ক্ষিত খরচ সংখ্যার আড়ালে ধামাচাপা দেয়ার দক্ষতা রাখেন। কাজেই কাগজে-কলমে সবকিছুই সুন্দর ও ভালো দেখাবে, কিন্তু তার আধারে যা থাকবে তা বোঝার জন্য অধিক দক্ষতা প্রয়োজন হবে। করপোরেট জগতের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, কাগজে-কলমে এখানে সবকিছুই ঠিক থাকে, কিন্তু সেই আইনি ভাষায় এবং ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিংয়ের মারপ্যাঁচে আপনাকে-আমাকে নিঃস্ব করার হাতিয়ার রয়েছে। এ হাতিয়ার ব্যবহার করে একজন প্রজ্ঞাশীল দূরদর্শী ব্যক্তি (ভিশনারি) সমাজকে সুশীলতার দিকে এগিয়ে নিতে পারেন, তেমনি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের নামে পশ্চিমা জগতের করপোরেট অ্যাকাউন্টিং পদ্ধতিকে নির্বিচারে আমাদের ব্যবসাজগতের ওপর চাপিয়ে দিয়ে অনেক ভ্রূণ পর্যায়ের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করতে পারেন। এ প্রক্রিয়ার বড় শিকার হবে এ দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক (ইনফর্মাল) খাত এবং তার ওপর নির্ভরশীল অসংখ্য প্রান্তিক জনসাধারণ। পৃথিবীর অন্য অনেক জায়গায় কিন্তু এ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দুঃখ এই যে পশ্চিমা বিশ্বে বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে গড়ে ওঠা কিছু চর্চা বিচার-বিশ্লেষণ না করে আমাদের দেশে চাপিয়ে দেয়া হয় এবং পশ্চিমা শিক্ষায় দীক্ষিত বিশিষ্টজনরা তার নেতিবাচক দিকগুলো আলোচনায় আনেন না। একটি উদাহরণ মনে পড়ছে। হস্তশিল্পে অনেক দ্রব্যই তৈরি হয়, যার ভেতর নানা জাতের উপকরণের মিশ্রণ রয়েছে। যেমন কাঠ, পাট, প্লাস্টিক, সুতাবস্ত্র, চামড়া ইত্যাদি। আমাদের এসব বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। আমরা যেন শুল্ক বিভাগের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের খপ্পরে পড়ে আমাদের দেশীয় দ্রব্যের রফতানি সম্ভাবনা খর্ব না করি, সে ব্যাপারে নতুন অর্থমন্ত্রীকে সংবেদনশীল হতে বলব।

এবার আসি ভ্যাট প্রসঙ্গে, যা মাঠপর্যায়ে কার্যকর করার অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা করেছেন বর্তমান অর্থমন্ত্রী ও তার প্রশাসন। ভ্যাটের মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এ প্রথায় ব্যবসায়ীরা সরকারের 'কালেকশন এজেন্ট' হিসেবে কাজ করেন, যাদের অনেকেই বিক্রয় ও মুনাফা কম দেখানোর সঙ্গে সংগতি রেখে প্রকৃত ভ্যাট সংগ্রহ কম দেখাতে চাইতে পারেন। এতে কর কম দিতে হয় এবং অপ্রদর্শিত ভ্যাট সংগ্রহ নিজেদের বাড়তি লাভ আনতে পারে। সম্ভবত এ চর্চা অর্থমন্ত্রীর অজানা নয় যে ব্যবসায়ীরা ভ্যাট কালেকশনের নামে নিজেরাই মুনাফা পেতে এবং লুটপাটে লিপ্ত হতে পারেন। বিষয়টি সাবেক মন্ত্রী যথার্থভাবে অনুধাবন করতেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। আমি আশা করছি, বর্তমান অর্থমন্ত্রী এ ব্যাপারে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেবেন, যাতে কর ব্যবস্থাপনায় যথাযথ জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা পায়।

সেবাধর্মী খাতের (সার্ভিসের) ওপর ভ্যাট আরোপের ক্ষেত্রে বেশকিছু অস্পষ্টতা রয়েছে এবং কথিত আছে, কর প্রশাসনের মর্জিমাফিক ব্যাখ্যার ভয়ে সেবা ক্রেতারা সেবা সরবরাহকারীদের ওপর অহেতুক করের বোঝা চাপিয়ে দেয়। প্রথাগতভাবে সংযোজিত মূল্যের ওপর কর বসার কথা, যেজন্য এটিকে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স বলা হয়। যদিও নির্দিষ্ট সেবা সরবরাহ করতে অনেক ধরনের মালাপত্র খরচ রয়েছে। পেমেন্টের সময় ক্রেতা পুরো চুক্তিমূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ হারে চার্জ আরোপ করে। শুধু তা-ই নয়, ক্রেতারা অনেক সময় আইন ঘেঁটে বুঝতে রাজি নন যে আগাম আয়কর কেবল নিয়োগদাতা সংস্থারই আছে এবং অযৌক্তিকভাব তারা গোড়াতেই মোট চুক্তিমূল্যের ওপর ১০ শতাংশ হারে আগাম আয়কর কেটে রাখেন। মানুষ হয়রানির এমন হাজারো দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। বিদেশী বিনিয়োগের দ্বার উন্মুক্ত করে স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এ-জাতীয় হয়রানির মুখে ঠেলে দেয়া কাম্য নয়। তাই এ বাজেটে ভ্যাটনীতির প্রায়োগিক দিকগুলোয় স্বচ্ছতা আনা জরুরি। সেই সঙ্গে স্বল্প হারে ভ্যাট প্রবর্তন করে সবাইকে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন, যা দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা পেতে সহায়তা করবে।

এবারের বাজেট বক্তৃতায় আমি আশা করব, গত ছয় বা তার অধিক বছরে নেয়া মেগা প্রজেক্টগুলোর আর্থিক ও সামাজিক অডিট (নিরীক্ষণ) উপস্থাপন করা হবে। যাত্রার শুরুতে অর্থমন্ত্রীর একটি বেঞ্চমার্ক প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ সম্পর্কে অবহিত করার চল এ বাজেট থেকেই শুরু হতে পারে। একই সঙ্গে স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন যে নগরজীবন বিপন্ন এবং এ ভোগান্তির পর আমরা যেন হঠাৎ না দেখি যে ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট তৈরি না হয়ে সংযুক্তির নামে সড়কপথ দুর্লভ নগর এলাকা দখল করেছে।

পদ্মা সেতুর দৃশ্যমানতা ক্রমেই আরো স্পষ্ট হচ্ছে। এটি আশাব্যঞ্জক। কিন্তু সমগ্র জ্বালানি (বিশেষত বিদ্যুৎ) উৎপাদন খাতের স্টকটেকিং নেয়া দরকার। বিশেষত প্রকল্পভিত্তিক প্রকিউরমেন্টে অনিয়ম সম্পর্কে গণমাধ্যমে যা জানা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তার ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। বাজেট বক্তৃতায় সরকারি প্রকল্পের অডিট পেশের অন্তর্ভুক্তি এক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম পন্থা।

প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে। কিন্তু কর্মসংস্থান হচ্ছে না। এটি কি আমাদের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয় নয়?

আমি সংখ্যা বিতর্কে ঢুকতে চাই না। সাধারণভাবে মনে করি, এ সংখ্যা দ্বারা তাড়িত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বিভিন্ন ধরনের প্রেক্ষাপট থেকে একই নম্বর তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ একই ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির ব্যাখ্যা নানা ধরনের প্রকৃত অর্থনীতির প্রকাশ হতে পারে। এর বিশদ আলোচনা তাদেরই সাজে, যারা মোট দেশজ উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের গণনা পদ্ধতি বিশদভাবে জানেন এবং সে আলোচনা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য ব্যবহার করেই করতে হবে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে ঋণের অর্থে বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণকালে সিমেন্ট তৈরি বা প্রকল্পভিত্তিক কর্মসংস্থান ও আয় দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। তাই সংখ্যাকেন্দ্রিক এ-জাতীয় বিতর্কে পক্ষে বা বিপক্ষে জড়িয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই। বরং আজকের প্রবৃদ্ধির প্রকৃতি বোঝা জরুরি এবং এটাও অনস্বীকার্য যে বড় মাপের ভৌত অবকাঠামোতে বিনিয়োগ এ দেশের জন্য খুব জরুরি ছিল। একটি বিষয় আমার খুব ভালো লেগেছে, সিঙ্গাপুর বা মালয়েশিয়ায় যারা কাজ করে দক্ষতা অর্জন করেছেন, তাদের অনেকেই বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার গঠনে আজ স্বদেশে কাজ করছেন। এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

এবার কর্মসংস্থানের বিষয়ে একটু বলি। শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আমাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাত্রা হতাশাব্যঞ্জক। মূলত অধিক অর্থবানদের নিরাপত্তা ও আমোদ-আহ্লাদ মেটানোর জন্য নিয়মিত হারে কর্মসংস্থান বাড়ছে। যে কারণে ড্রাইভার, নিরাপত্তা প্রহরী ও অন্যান্য সহযোগী খাতে নানা মোড়কে কর্মসংস্থান হচ্ছে। দলীয় রাজনীতির অঙ্গনেও এর প্রকাশ ঘটছে, ভাড়া করা জনতা ও নানা আবরণের লাঠিয়াল বাহিনীর স্ফীতিসাধনে। এসবের ফলে একটি বিকৃত, বিকলাঙ্গময় নগরসমাজ গড়ে উঠছে। আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ অনেক ক্ষেত্রে ঋণের ওপর নির্ভরশীল, ব্যক্তি আয় বহুলাংশে প্রকল্পের প্রকিউরমেন্টনির্ভর এবং ভোগ অনেকাংশে বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স, স্থাবর সম্পত্তির বাজারদর বৃদ্ধি অথবা খাজনা-আদায়ের (বা কমিশন/দালালি আয়) ওপর নির্ভর করে। এ ধরনের সমাজে আয়বৈষম্য দূর করা দুরূহ। তবে পরিহাসের বিষয়, সম্পদশালীদের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে গরিবের মাঝে আয়ের পুনর্বণ্টন ঘটছে। বৈশ্বিকভাবে এটিই প্রবৃদ্ধির প্রকৃতি। একই ধারায় বাংলাদেশ চলতে থাকলে সময়ের আবর্তে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা চরম রূপ নিতে পারে এবং বহিঃশক্তির প্ররোচনায় যেকোনো সময় তার নৈরাজ্যিক প্রকাশ ঘটতে পারে।

একটা সময় মনে হয়েছিল, তৈরি পোশাক ও অন্যান্য শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে এ দেশে কর্মসংস্থান বাড়বে, যা সমাজের অন্যান্য অঙ্গনে পরিবর্তন ত্বরান্বিত করবে। সেটি আশানুরূপ না হওয়ার কারণে এবং অব্যাহতভাবে প্রযুক্তি দ্বারা মনুষ্যশ্রমের প্রতিস্থাপনের ফলে শ্রমবাজার স্থবির হয়ে পড়ছে। আমরা হয়তো আরো কিছুদিন শ্রমঘন শিল্পের দ্রব্য রফতানি করে প্রতিযোগী থেকে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে পারব। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় প্রযুক্তি এত দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকবে যে আগের উৎপাদনশীল শ্রম অপ্রয়োজনীয় হয়ে অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে, যা শ্রেণীসংগ্রামভিত্তিক উত্তরণ না এনে নৈরাজ্য সৃষ্টির উপাদান দেবে। এখনকার সমৃদ্ধি পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার না করলে পরবর্তী সময়ে আমাদের ভুগতে হবে। পরিকল্পনার একটি বড় দাবিদার হলো শিক্ষা। এটি অনস্বীকার্য, সংস্কৃতমনার বাইরেও বাস্তব শিক্ষাজ্ঞান ও বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের ওপর জোর দিতে হবে। তবে এ খাতে প্রচুর অপচয় হচ্ছে, যার নৈর্ব্যক্তিক পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন এবং নীতিপর্যায়ে দিকনির্দেশনা জরুরি। বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু বলব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অঙ্গনে ক্লাসরুমকেন্দ্রিক শিক্ষার বাইরে ভিন্নধর্মী জ্ঞানচর্চার মডেল বাস্তব পরীক্ষায় যাচাই করা উচিত। এমনকি বিজ্ঞানকেন্দ্রিক যুক্তিবাদী মৌলিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ না করে সংকীর্ণ পেশায় দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশের বাজারে শ্রম পাঠিয়ে দ্রুত রেমিট্যান্স বৃদ্ধির উদ্যোগ আদতেই টেকসই কিনা তা পুনরায় ভাবা প্রয়োজন।

যেহেতু বাজেট অর্থনৈতিক সুশাসনের কথা বলবে, পরিশেষে কিছুসাধারণ মন্তব্য করব। দক্ষ শ্রমের অভাবে এ দেশে বিজনেসের প্রকৃত ব্যয় অনেক বেশি। উপরন্তু স্থানীয় মাস্তান (লোকাল টাউট) থেকে শুরু করে ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদহার দেশীয় পুঁজি বিকাশের প্রতিটি পদে বাধা সৃষ্টি করে। এসবের প্রতিকার না করে আমরা ফ্যাসিলিটেড করছি বিদেশী বিনিয়োগ, অবকাঠামো গড়তে বিদেশ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিচ্ছি, আবার ফরেন কারেন্সিগুলো দেদার বেরিয়ে যেতে নানাভাবে সাহায্য করছি। আশা করব, দুটি বিষয়ে সুচিন্তিত উদ্যোগ নেয়া হবে: (১) বাইরে কর্মরত দক্ষ শ্রমিককে উপযুক্ত সম্মানী দিয়ে দেশে চলমান প্রকল্পে নিয়োগ করতে উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা। (২) প্রকল্প অর্থায়নে চড়া সুদের বিদেশী ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে রেমিট্যান্স ও রফতানি থেকে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার অর্থবহ ব্যবহার। এটি নিশ্চিত করার একটি প্রস্তাবনা সাক্ষাৎকারের শুরুতেই বলেছি। প্রয়োজনে মালয়েশিয়ার ডা. মাহাথিরের পথ ধরে পুরনো ঋণচুক্তি (কনট্রাক্ট) রিনেগোশিয়েট করা যেতে পারে।

তবে ব্যক্তিস্বার্থে বিদেশী ঋণনির্ভর প্রকল্পের প্রতি প্রশাসন ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ঝোঁক সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের পূর্বশর্ত।

দেশ থেকে অর্থ পাচার বৃদ্ধির কারণ কী বলে মনে করেন?

বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের জোগান ও চাহিদার যথার্থ বিশ্লেষণ করে প্রায়োগিক বিবেচনাসাপেক্ষে সময়োপযোগী বাস্তবসম্মত নীতিমালা প্রণয়নে ব্যর্থতাই মূল কারণ মনে হয়। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে বলতে হয়, উপযুক্ত ফিন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট (আর্থিক উপকরণ) ডিজাইন ও তা প্রবর্তনে ব্যর্থতার কারণেই আইনি কাঠামোয় অর্থ-সম্পদ স্থানান্তরের অপূর্ণ চাহিদা অপ্রাতিষ্ঠানিক (কার্ব) বাজারকে সজীব রেখে অর্থ পাচার নিশ্চিত করে। প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেনে বিলম্ব ও অনেক ক্ষেত্রে অনিশ্চিত জটিলতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক পথের বাইরে অনেকেই বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাতে পারে এবং সে পথে আসা অর্থ পাচারের চাহিদা আংশিকভাবে হলেও মেটায়। কিন্তু বিরাজমান আইনি ব্যবস্থায় উপযুক্ত আর্থিক উপকরণ না থাকায় অর্থ পাচারের চাহিদা তীব্র হলে কার্ব বাজারও চাঙ্গা হয়। এক স্থান থেকে অন্যত্র অর্থ স্থানান্তরের চাহিদা চিরন্তন এবং তা ভালো-মন্দে মেশানো। সাদামাটাভাবে বললে, আইনকে ধোঁকা দিয়ে আমদানি চালানমূল্য বাড়িয়ে (ওভার ইনভয়েসিং) অথবা কার্ব বাজার থেকে ক্রয় বা হুন্ডির মাধ্যমে সঞ্চয়ের (অর্থ-সম্পদের) দেশান্তরকে আমরা অর্থ পাচার হিসেবে গণ্য করি। অনেক ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ও এলসি খরচ কম করার উদ্দেশ্যে আমদানি চালানমূল্য কম দেখিয়ে (আন্ডার ইনভয়েসিং) করে আমদানি খরচের বাকি অংশ হুন্ডির মাধ্যমে পরিশোধের কথা জানা যায়। অর্থ পাচারের আলোচনা যে আঙ্গিকে করা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এ-জাতীয় পরিশোধ (পেমেন্ট) পদ্ধতিকে 'অর্থ পাচার' অপবাদ দিতে অনেকেই দ্বিধা করবেন। যতদিন পর্যন্ত অন্য প্রান্তের সরকার সেই অর্থগ্রহণকে বেআইনি চিহ্নিত করছে না, আমাদের মতো দেশে তা বন্ধ করা দুরূহ। আমার আলোচনায় এ প্রসঙ্গ বাদ রেখেছি।

এটা অনুলাপ শোনালেও সত্য, সঞ্চয় স্থানান্তরের আইনি পথ সুগম করলে 'পাচার'-এর মাত্রা কমবে। তবে এসবের মূলে রয়েছে অর্থ-সম্পদ স্থানান্তরের চাহিদা, যা নানা কারণে বাড়তে পারে। এ চাহিদা স্থানীয় অর্থনীতিতে সম্পদ গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত এবং বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে তা অধিক জটিল রূপ নিয়েছে। বিদেশী সংস্থাকে ঠিকাদারি বা লাইসেন্স পাইয়ে দেয়া থেকে প্রাপ্ত কমিশন অদৃশ্য থাকতে পারে এবং স্বদেশ বঞ্চিত হলেও যা প্রবেশ করেনি, তাকে পাচারের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন। তবে বাংলাদেশী মুদ্রায় যাদের হাতে এ-জাতীয় খাজনা বা উপরি আয় আসে এবং তা যদি অপ্রদর্শিত আয়ের অংশ হয়, সেই অর্থ-সম্পদ বাইরে পাঠাতে হলে কার্ব বাজারের আশ্রয় নেয়া আবশ্যিক হয়। এমনকি আইনি পথে অর্জিত সঞ্চয় অনেকেই দেশের বাইরে পাঠাতে চাইতে পারে, যেমনটি ঘটে আমাদের দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বা রেমিট্যান্সপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে। আপেক্ষিক অর্থে, যদি ভিনদেশে জীবনের নিরাপত্তা থাকে এবং জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্য থাকে, সুযোগ থাকলে আমাদের অনেকেই সে দেশে সম্পদ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে। অর্থাৎ নিজ দেশ থেকে ভিনদেশে অর্থ-সম্পদ স্থানান্তর করবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য অনেক দেশই 'সেকেন্ড হোম' কর্মসূচি সদর্পে প্রচার করে এবং সেসব দেশের সরকার এ প্রক্রিয়ায় অর্থ-সম্পদ স্থানান্তরকে বেআইনি গণ্য করে না!

বিদেশে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে অর্থ স্থানান্তর অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত, যার ভালো-মন্দের বিচার এখানে করব না। স্থানান্তরের চাহিদা বৃদ্ধিতে 'পারিবারিক' খাত বিশেষ গুরুত্ব রাখে, যা সবার জানা থাকলেও কাগজে-কলমে অদৃশ্য রয়ে যায়। বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের অনেকেরই ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন বিভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে। তাদের অনেকেই এ দেশে বসবাসরত মা-বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে নিয়মিতভাবে লেনদেনে জড়িত। আইনি পথে বিদেশে অভিবাসন নেয়া উত্তরাধিকারীদের হাতে সম্পত্তির ভাগ হস্তান্তরের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় পরিবার পর্যায়ে অনেককেই আজ বেআইনি পথের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। এ চাহিদার পরিমাণ নিতান্ত ছোটখাটো কোনো সংখ্যা নয়। একটি উদহারণ দেয়া যেতে পারে। একটি সম্পত্তি বিক্রি করে আড়াই কোটি টাকা হস্তান্তরের চাহিদা হলে প্রতি বছর ৪০০ সমমানের সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য বিদেশে নাগরিকত্ব নেয়া পরিবার-পরিজনকে পাঠাতে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্থানান্তর চাহিদা হবে! একইভাবে ভারতীয় অভিবাসন নীতির কারণে শুধু তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত বিদেশীদের জন্য নয়, বরং দুই পাড়ে বসবাসরত পরিবারের ভেতরকার অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ থেকে ভারতে রেমিটেন্সপ্রবাহ ঘটতে পারে।

গোড়ার প্রশ্নে ফিরি। তথাকথিত অর্থ পাচার সব দেশেই কমবেশি ঘটে এবং তা পর্যায়ক্রমিক দুটি কারণে ঘটে: (১) অর্থ-সম্পদ স্থানান্তরের (দেশান্তরের) চাহিদা বৃদ্ধি, যা প্রান্তিক দেশগুলোয় পরনির্ভর উন্নয়ন প্রক্রিয়া, আয় ও সম্পদের বৈষম্য, স্বদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ গড়ে তুলতে ব্যর্থতা এবং বিশ্বায়নকালে বিত্তবানদের উন্নত দেশে অভিবাসন নেয়ার সঙ্গে জড়িত। (২) উল্লিখিত চাহিদা মেটানোর জন্য সুচিন্তিত নীতি জনসমক্ষে না থাকায় 'অর্থ-সম্পদ পাচার'-এর সঙ্গে বিশালসংখ্যক নাগরিক ও বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক জড়িয়ে পড়েছে।

প্রথমটি সামষ্টিক নীতির বিষয়, যেখানে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ জরুরি। তবে সুষ্ঠু আইনি কাঠামোর অনুপস্থিতির মূল শিকার হলো আমাদের নৈতিকতা। অর্থাৎ আজকে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় যুক্ত (নাগরিক, প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যক্তিত্ব, রাজনীতিবিদ কিংবা ব্যবসায়ী) সবারই একটি নৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে। আজ মুদ্রাবাজারের লেনদেনের ক্ষেত্রে এমন কোনো নীতি নেই, যার মাধ্যমে তারা আইনানুগভাবে নিজেদের (অর্থ-সম্পদ স্থানান্তরের) চাহিদা মেটাতে পারে। সেজন্য তারা বাধ্য হচ্ছে অনৈতিক কিংবা বেআইনি কাজে জড়িয়ে পড়তে। সুতরাং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা কিংবা তার ধারক-বাহক হওয়ার নৈতিক অধিকার তাদের আদতেই আছে কিনা সে ব্যাপারে সবার মনে অনাস্থা রয়েছে।

এখান থেকে বেরোনোর কোনো পথ নেই?

দীর্ঘদিন অনিয়মে গা ভাসিয়ে অর্থ পাচারে লিপ্ত হয়ে আমাদের সমাজে যে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে, তা থেকে বেরোনো জরুরি। তবে স্বাভাবিক অর্থ-সম্পদ স্থানান্তর চাহিদা অনাকাঙ্ক্ষিত কিনা তা বিতর্কের বিষয়। সাধারণত নীতিপর্যায়ে আগে প্রস্তাবিত কাঠামোয় আলোচনা হয় না। আংশিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অনেকে প্রকৃত মুদ্রা বিনিময় হারের সঙ্গে আইনি খাতের বিনিময় হারের সামঞ্জস্য এনে কার্ব বাজারের কার্যকারিতা খর্ব করার কথা ভাবেন। তারা ভুলে যান যে সম্পদ স্থানান্তরের ব্যক্তিচাহিদা প্রতিনিয়ত কার্ব বাজারের বিনিময় হারকে নিয়ন্ত্রিত বাজারের হার থেকে অধিক রাখতে ভূমিকা রাখবে। বাস্তবতার নিরিখে তাই বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো রেগুলেটর, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বৈদেশিক মুদ্রাপ্রাপ্তির খাতওয়ারি কোটা আরোপে বেশি আগ্রহী। ইদানীং এমনও শোনা যায়, বৈদেশিক মুদ্রাবাজার উন্মুক্ত করে দিলে (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট কনভার্টিবিলিটি) বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ রাতারাতি নিঃশেষ হবে এবং সে কারণে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দরখাস্তভিত্তিক অর্থ-সম্পদ স্থানান্তরের সুযোগ দেয়া হতে পারে। সে-জাতীয় উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অর্থের বহির্গমনকে আইনি মোড়কে এনে কার্ব বাজারে চাপ কমাবে। তবে জনসমক্ষের আড়ালে বেছে বেছে সুবিধা দেয়ার রীতি ক্ষমতাধারী ও অর্থবানদের পক্ষে যায় এবং দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়। ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় এ দুর্বলতা আমরা নিকট অতীতে দেখেছি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে দেশে উৎপাদনশীল সম্পদ গড়ে উঠলে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে এবং উন্নয়ন খরচ ও প্রবৃদ্ধি থেকে লাভের বড় অংশ বাইরে বসবাসরত ও বহির্মুখী গোষ্ঠীদের হাতে না গেলে অর্থ- সম্পদ স্থানান্তরের চাহিদা অস্বাভাবিক হবে না। কিন্তু স্বদেশে সে পরিবেশ রাতারাতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে দেশকে সে পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট খাতে নিজ ভাণ্ডারে সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার জরুরি। এ বিনিয়োগের একাংশ বৈদেশিক মুদ্রার চলতি বাজারে সচেতন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অর্জন সম্ভব, যা একই সঙ্গে অর্থ-সম্পদ পাচারের গ্লানি থেকে বৃহত্তর সমাজকে মুক্ত করবে। এজন্য অবশ্য উপযুক্ত আর্থিক উপকরণ (ফিন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট) প্রবর্তন করা প্রয়োজন, যা বিদেশে অর্থ প্রেরণ ও স্বদেশে বিনিয়োগকে একটি আইনি কাঠামোয় সংযুক্ত করবে এবং বাস্তবসম্মতভাবে অর্থ বহির্গমনকে প্রয়োজনীয় সময় কাঠামোয় বেঁধে বৈদেশিক মুদ্রাবাজার অস্থিতিশীল হতে দেবে না।

নীতিনির্ধারকদের বিবেচনার জন্য একটি উদহারণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত ইনস্ট্রুমেন্টের ব্যাখ্যা দেয়া যায়। নীতিপর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হলেই কেবল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্ভব, যা এখানে করা হয়নি। অনেকেরই সন্তান বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এদের কেউ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীকে পাঠাতে চায়, তাকে নিয়ন্ত্রিতভাবে তা করতে দেয়ার কেসটি গণ্য করা যাক। অনুমান করছি, বাংলাদেশের কোনো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভিনদেশের নাগরিকত্ব নিলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাকে অমানবিক গণ্য করায় তা শত্রুসম্পত্তি আইন-জাতীয় কোনো বিধানের আওতায় আসবে না। একটি গ্রহণযোগ্য উপায় হলো, নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিয়ে সম্পত্তির মূল্য বা সঞ্চিত অর্থের একটি অংশ বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত উত্তরাধিকারীদের পাঠানোর অনুমতি প্রদান। সেবা খরচ বাদ দিয়ে ওই করের অর্থ সরকারের ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগে রূপান্তর সম্ভব।

এককালীন কর আরোপের দ্বিবিধ সমস্যা রয়েছে: (১) অনুমোদিত অর্থ প্রেরণের পরিমাণ কম রাখতে চাইলে উচ্চহারে করারোপ করতে হয়, যা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সম্ভাব্য অর্থ প্রেরক কার্ব বাজার বা হুন্ডির আশ্রয় নেবে। (২) কর গ্রহণের নামে সরকারি ভাণ্ডারে যে অর্থ জমা পড়বে, তা বিনিয়োগে ব্যয় হওয়ার নিশ্চয়তা না থাকায় এ পন্থার প্রতি মানুষের আস্থা জাগানো মুশকিল।

শেষোক্ত বিষয়টি সমাধানকল্পে বিকল্প প্রস্তাবনা ভাবা যেতে পারে। একজন ব্যক্তি বা পরিবারের বিদেশে অর্থ প্রেরণের কাঙ্ক্ষিত চাহিদার একটি অংশ আইনি পথে বেরোনোর সুযোগ দিয়ে অন্য অংশ চিহ্নিত কিছু বৃহৎ প্রকল্পে ডিবেঞ্চার বা বন্ডভিত্তিক বিনিয়োগ বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। বিনিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প নির্বাচন ব্যক্তির পছন্দমতো হতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদি ছকে ফেলে সে বিনিয়োগ ভাঙিয়ে বিদেশে অর্থ প্রেরণের বাকি চাহিদা নিয়ন্ত্রিত গতিতে মেটানো সম্ভব। কত অংশ বা সর্বাধিক কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের অনুমোদন দেয়া উচিত, কোন কোন খাতে বিনিয়োগ সুবিধা থাকতে পারে, কী ব্যবস্থাপনায় ও ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করে সে বিনিয়োগ কার্যকর করা যেতে পারে, সেসবই বিস্তারিত আলোচনাসাপেক্ষ, যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এ-জাতীয় প্রস্তাব নীতিগতভাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়।

আজকে যদি বিদেশে অর্থ-সম্পদ পাঠানোর জন্য আমার চাহিদা কমে যায়, আমি যদি আইনের পথ ধরে সরকারের একটি নতুন নীতিমালার আলোকে প্রলম্বিত সময়জুড়ে কিছু অর্থ পূর্বনির্ধারিত কিছু প্রকল্পে বিনিয়োগ করি, তাহলে দুটো লাভ হবে। প্রথমত, চাহিদা কমে গিয়ে কার্ব বাজারের মাধ্যমে অর্থ পাচারের আকর্ষণ কমে যাবে। দ্বিতীয়ত, কার্ব বাজারে বিনিময় হারজনিত লাভের পরিমাণ কমায়, যারা দেশে অর্থ পাঠায়, তারা আইনি প্রাতিষ্ঠানিক পথ দিয়ে (ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে) অর্থ পাঠাতে উদ্বুদ্ধ হবে। এসবের ফলে সবচেয়ে লাভবান হবে নৈতিকতা। যখন মানুষ বুঝবে, সে যা করছে তাতে অনৈতিক কোনো কিছু নেই অথবা আইনবিরোধী কিছু নেই, তখন সে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবে।

আমি মনে করি, এ ধরনের একটি ফিন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট ডিজাইন করা অর্থ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রকদের (যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক পর্ষদ) দায়িত্ব। বহু বছর আমরা এটি উপেক্ষা করে গেছি। মনে আছে, প্রতি বছর বাজেট-পূর্ব পরামর্শকালে সাবেক অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে প্রকাশ্যে সেকেন্ড হোম প্রচারণা ও অর্থ পাচারের বিষয়গুলো বিধিগতভাবে সমাধান করার কথা বলা হয়েছিল। কেন অন্য দেশ প্রকাশ্যে এটা করতে থাকবে এবং এক্ষেত্রে আমরা কী করে চুপ থাকি? এখনো অন্যান্য দেশ সেসব দেশে যাওয়া অর্থ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে না, অথচ আমাদের এখানে অর্থ পাচার আইনের (মানি লন্ডারিং অ্যান্ড অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ফিন্যান্সিং অ্যাক্টের) নামে আমাদের কর্মপরিধি বেঁধে রাখা হচ্ছে। দুঃখজনক, আমাদের দেশের বিধিপ্রণয়নকারী সংস্থাগুলো এসব আলোচনায় নীরব থাকে।

শ্রুতিলিখন: **হুমায়ুন কবির**